ধারাবাহিক রচনা

অনন্য অজন্তায়

লতা দাস (পাল)

আমরা সপ্তদশ গুহাবিহারে ন্যগ্রোধমৃগ-জাতক কথার চিত্ররূপায়ণ দেখছি। আচার্য গৌতমবুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনবিহারে থাকাকালীন কশ্যপ ভিক্ষুর মায়ের প্রসঙ্গে এটি বর্ণনা করেছিলেন। ওই ভিক্ষুর মা একজন ধনবান শ্রেষ্ঠীর কন্যা ছিলেন। আবাল্য তিনি সংসারের সমস্ত বিলাসদ্রব্য সম্বন্ধে অতি উদাসীনা, ধর্মপ্রাণা, সুচরিতা ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য তাঁর সর্বদাই চেষ্টা ছিল। তাই প্রাত্যহিক জীবনে ধর্ম-কর্ম-উপাসনায় তাঁর মনের উত্তরণ ঘটছিল।

একদিন শ্রেষ্ঠীকন্যা বৌদ্ধ ধর্মসঙ্ঘে যোগদানের প্রবল ইচ্ছার কথা পিতামাতার কাছে ব্যক্ত করলেন। তাঁরা অনুমতি দিলেন না, বললেন—তুমি আমাদের একমাত্র কন্যা, কী হবে তাহলে এত সম্পদের! তখন তিনি বিবাহের পর স্বামীর কাছে তাঁর সংকল্পের কথা প্রকাশ করবেন ঠিক করলেন।

পতিগৃহেও শ্রেষ্ঠীকন্যা ছিলেন সমর্পিতমন, আদর্শ জায়া। তিনি গর্ভবতী হলেন, কিন্তু তা ঠিক বুঝতে পারলেন না। সেইসময়ে বিশেষ উৎসবে নগর সেজে উঠল যেন অমরাবতী। ঘরে ঘরে সকলে বস্ত্রে-অলংকারে সুসজ্জিত। উৎসবের দিনেও শ্রেষ্ঠীকন্যার স্বামী দেখলেন, তাঁর স্ত্রী প্রতিদিনের মতোই সাধারণ হয়ে আছেন—বসনে-ভূষণে নতুন সাজসজ্জা নেই, প্রসাধনের ব্যবহার নেই। তিনি স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন—কত অজস্র প্রসাধন, চারু কারুকাজপূর্ণ বারাণসীর রেশমবস্ত্র আর মণিরত্নখচিত অলংকারের সম্ভার সব সাজানো রয়েছে তোমার জন্যে। তবু তুমি কেন সাজসজ্জাহীন, আভরণহীন?

শ্রেষ্ঠীকন্যা তখন নম্রভাবে উত্তর দিলেন—হে বল্লভ, এই দেহের অসারত্ব অনেক, এ শুধু অস্থি-রক্ত-মাংসের সমষ্টি—এ-দেহের কাঠামো না স্বর্গীয়, না স্বর্ণময়, না চন্দনগন্ধময়। দেহ অমর নয়, বরং তা দূষণপ্রবণ, সর্বদা ব্যাধির সম্ভাবনা, পরিবর্তনশীল, ক্ষয়-মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কামনা-বাসনাময় এই দেহ দুঃখ-শোকের জন্মদাতা। এ একদিন প্রাণ হারিয়ে পচে জীবাণুর খাদ্য হবে। এ-দেহের প্রতি আমার তাই বিশেষ কোনও আকর্ষণ নেই—বাইরে থেকে দেহকে সাজিয়েই বা কী হবে? মানুষের অন্তরের সৌন্দর্যই আসল, হৃদয়ের মধ্যে আমার ধর্মসজ্জার সাধ আছে—আমি অর্হত্ত্ব লাভ করতে চাই—সেই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা আমার চিত্তকে সর্বদা ধর্মভাবনায় ভরিয়ে রাখে। তাই সাজসজ্জা বিলাস মনে হয়।

স্বামী বললেন—তবে তুমি ভিক্ষুণী হও না কেন?

শ্রেষ্ঠীকন্যা বললেন—হে প্রিয়, যদি অনুমতি দেন, তবে এই মুহূর্তেই আমি সেই সংকল্পের জন্য শপথ নিতে পারি।

বিবেচক স্বামী বৌদ্ধসঙ্ঘের ভিক্ষুণী হওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই সঙ্ঘ দেবদত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছিল। সঙ্ঘে কিছুদিন কাটলে অন্যান্য ভিক্ষুণীগণ বুঝতে পারলেন, ভিক্ষুণী শ্রেষ্ঠীকন্যা গর্ভবতী। তাঁরা বিপন্নবোধ করে সঙ্ঘপ্রধান দেবদত্তকে সেকথা জানালেন।

সর্বজনীন করুণা-প্রেম-মৈত্রীর আদর্শ বুদ্ধদেবের মতো দেবদত্তের হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ ছিল না। তিনি সঙ্ঘ থেকে শ্রেষ্ঠীকন্যাকে বহিষ্কারের আদেশ দিলেন।

এদিকে ভিক্ষুণীদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রেষ্ঠীকন্যা জানালেন—আমি সন্তানসম্ভবা সত্য, কিন্তু আমি ধর্মীয়ভাবে জীবনযাপন করেছি, কোনও গর্হিত কাজ বা ব্যভিচার কখনও করিনি। বৌদ্ধধর্মের প্রতি আমি আকৃষ্ট জেনে আমার স্বামী অনুগ্রহ করে স্বয়ং আমার সঙ্ঘে যোগদানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

একথার সত্যতা ভিক্ষুণীবৃন্দ অনুভব করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝলেন যে দেবদত্ত তাঁকে সঙ্ঘে রাখবেন না। তাই তাঁরা সবাই একসঙ্গে সঙ্ঘ ত্যাগ করলেন।

ভিক্ষুণী শ্রেষ্ঠীকন্যা শান্ত-সংযত হয়ে বললেন—আমি জানি দেবদত্ত বুদ্ধ নন, আমি বুদ্ধের পাদপদ্ম স্মরণ করে বৌদ্ধধর্মে শপথ নিয়েছি, আপনারা আমাকে শ্রাবস্তীর জেতবনে গৌতম বুদ্ধের কাছে নিয়ে চলুন। তাঁর কথামতো ভিক্ষুণীগণ রাজগৃহ (বর্তমান রাজগীর) থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ লীগ (এক লীগ হল তিন কিলোমিটার) দূরে জেতবনবিহারে উপস্থিত হয়ে গৌতমবুদ্ধকে সমস্ত জানালেন।

বুদ্ধদেব সব শুনলেন। এ-জটিল সমস্যার সুষ্ঠু ও ন্যায়নিষ্ঠ সমাধান প্রয়োজন, সমাজ-বিধান নারীদের প্রতি কঠিন। তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ, বৌদ্ধ উপাসিকা খ্যাতনামা বিশাখা ও অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করলেন। কারণ, তিনিও জানতেন দেবদত্ত কর্তৃক বহিষ্কৃত ভিক্ষুণীর পুণ্যধর্মময় জীবনের কথা প্রতিষ্ঠিত করে সুবিচারপূর্বক তাকে সঙ্ঘে গ্রহণ না করলে, সঙ্ঘ বা ভিক্ষুণী কারওরই কল্যাণ হবে না। ইতিমধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠীকন্যার অবিবাহিত ও বিবাহিত জীবনের সব তথ্য সংগ্রহ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

প্রজ্ঞাবান, মেধাবী কোশলরাজকে বুদ্ধদেব এই মীমাংসার ভার দিলেন, যাতে সঙ্ঘের সুনামও অক্ষুণ্ণ থাকে এবং শ্রেষ্ঠীকন্যার ধর্মানুমোদিত স্বচ্ছ জীবনযাপন ও অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হয়। সত্য প্রকাশ পেল, শ্রেষ্ঠীকন্যার প্রতি সুবিচারও হল। তিনি অন্যান্য ভিক্ষুণীগণসহ দেবদত্তের সঙ্ঘেই ফিরে এলেন। যথাকালে তাঁর সন্তান জন্মাল। সঙ্ঘে ধর্মীয় জীবনের অসুবিধার কথা চিন্তা করে রাজা সেই সন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষার সব ভার গ্রহণ করলেন। রাজকুমারের মতো সেই শিশু প্রাসাদে বড় হতে লাগল। মাত্র সাত বৎসর বয়সে সে বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগদান করল। কালে অর্হত্ত্ব অর্জন করে মহাথের কশ্যপ নামে পরিচিত ও ধর্মপ্রচারের জন্য খ্যাতনামা হয়ে উঠল সে। তার মাতাও অর্হত্ত্ব লাভ করে ধর্মের সর্বোচ্চ ফলের অধিকারিণী হলেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব কশ্যপ সম্পর্কে বলতেন, মধ্যরাতের চাঁদের মতো জ্যোতির্ময় ভিক্ষু কশ্যপ ধর্মপথে আলো বিকীর্ণ করে থাকেন, তিনি এক অসাধারণ ধর্মপ্রাণ মমতাময় মহাভিক্ষু—মহৎ ও সকলের মিত্র।

একদিন জেতবনবিহারে ভিক্ষুগণ আলোচনা করছিলেন—বুদ্ধের মতো দেবদত্তের দান, প্রজ্ঞা, প্রেম, করুণা, স্নেহ, মৈত্রীভাব ছিল না, ফলে ভিক্ষু কশ্যপ ও তাঁর মায়ের মতো প্রকৃত ভিক্ষুণীর ধর্মীয় সম্ভাবনা নষ্ট হতে চলেছিল, কিন্তু আমাদের শাস্তা পরমকারুণিক বুদ্ধের কৃপায় তাঁরা সফল ও সুখ্যাত হলেন। এই আলোচনা গৌতমবুদ্ধের শ্রুতিগোচর হলে তিনি বললেন, অতীতেও তিনি তাঁদের মুক্তি দিয়েছিলেন। সেদিনের সান্ধ্যসভায় ন্যগ্রোধমৃগ-জাতককাহিনি বর্ণনা করলেন তিনি।

প্রাচীনকালে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে গৌতমবুদ্ধ হরিণ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সোনার মতো গায়ের রং, সুন্দর আঁকাবাঁকা শাখাময় রুপোলি শিং, বড় বড় চোখের সুন্দর চাহনি, রাঙামুখ, গলার স্বর মধুর, ছোট্ট লেজটি যেন চমরীর লেজ, চমৎকার পিঠের বাঁক, পায়ের মসৃণ-কালো উজ্জ্বল খুর, দেহের আয়তন কিছু বড়—যেন অশ্বশাবক। তিনি পাঁচশো মৃগদলের রাজা—ন্যগ্রোধ-মৃগরাজ—বনে মৃগদলসহ সুখে স্বচ্ছন্দে স্বাধীন আনন্দময় জীবনযাপন করতেন।

ওই একই বনে কিছুদূরে তাঁরই মতন সোনার বরণ আর একটি মৃগও বাস করত, তার নাম ছিল শাখামৃগ। তারও পাঁচশো মৃগ-অনুচর, সেও মৃগদলপতি। বনে তারও রাজার মতো বিহার।

বারাণসীর মৃগয়াপ্রিয় রাজা প্রতিদিন মৃগয়া করতেন। হরিণের মাংস তাঁর অতিপ্রিয়। প্রত্যহ মৃগয়ার ফলে বহু অসুবিধা দেখা দিল, রাজকার্যেও ব্যাঘাত ঘটল। তখন প্রজারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে রাজোদ্যানে তৃণরোপণ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করে বন থেকে মৃগদলপতি সহ সমস্ত মৃগকে এনে একপ্রকার বন্দি করে রাখল। আর মৃগয়ার প্রয়োজন হবে না, সময়-অর্থ দুই-ই বাঁচল, উদ্যানে গিয়ে মাংসের জন্য রোজ একটি করে মৃগ বধ করলেই চলবে। প্রজাদের এই পরিকল্পনাতেও অসুবিধা দেখা দিল। রাজা উদ্যানে এসে দলপতিদের দেখেই বুঝেছিলেন ওরা মৃগদলের দুই দলপতি। তিনি মৃগরাজদের অভয় দিয়ে বলেছিলেন—যাও, তোমরা বনে নির্ভয়ে বিহার করো। কিন্তু অন্য মৃগদের রেহাই ছিল না, রাজা কিংবা রাজার পাচক প্রতিদিন উদ্যানে একটি করে মৃগবধ করার উদ্দেশ্যে আসতেন। বনের চেয়ে ছোট রাজ উদ্যানে ধনুকের টংকার শুনে প্রাণভয়ে হরিণেরা ছোটাছুটি করত, ফলে একটির জায়গায় একাধিক হরিণের মৃত্যু ঘটত; সেটিও বাঞ্ছনীয় নয়। মৃগদলপতি অসহায়, মৃগদল অসন্তোষে ক্ষোভে-দুঃখে-নৈরাশ্যে প্রাণনাশের ভয়ে ভীত হয়ে ব্যর্থ দিনযাপন করত।

এইরকম বীভৎস পরিস্থিতিতে বোধিসত্ত্ব ন্যগ্রোধ-মৃগরাজ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে শাখামৃগের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করলেন—দু-দলের মধ্যে পালাক্রমে রোজ একটি করে মৃগ বধ্যভূমিতে এসে যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে রাখবে। এই নিয়ম চলতে থাকল। একদিন শাখামৃগের দলের এক গর্ভবতী হরিণীর পালা পড়ল। সে তখন তাদের রাজা শাখামৃগকে জানাল—আমি অন্তঃসত্ত্বা, প্রসবের পর আমরা দুজন হব। অতএব এখন এই পালার বদল করলে, পরে আমরা দুজনেই প্রাণ দিতে পারব। অনুগ্রহ করে যদি পালা বদল করে কিছু সময় আমার মৃত্যুরোধ করেন, হে রাজা, তবে আমার শাবকটিকে অন্তত দেখার ও কিছুদিন লালন করার সৌভাগ্য লাভ করি।

হরিণীর আকুল প্রার্থনা শাখামৃগরাজের মনে করুণা জাগাতে ব্যর্থ হল। সে রুষ্ট ও রুক্ষস্বরে বলল—পালা বদল করা যাবে না, অন্য কার ওপর তা চাপাব? এ অসম্ভব। তোমার অদৃষ্টভার তোমাকেই ভোগ করতে হবে, যাও বধ্যভূমিতে।

হরিণী আশা হারাল না, সে বোধিসত্ত্ব ন্যগ্রোধ-মৃগের কাছে গিয়ে সব জানিয়ে প্রাণভিক্ষা করল। বোধিসত্ত্ব সব শুনে বললেন—তুমি নির্ভয়ে বনে ফিরে যাও। আমি উপায় স্থির করেছি।

হরিণী ফিরে গেল, আর বোধিসত্ত্ব বধ্যভূমিতে গিয়ে যূপকাষ্ঠে মাথা রেখে শুয়ে রইলেন।

পাচক সেদিন মৃগবধ করতে এসে যূপকাষ্ঠে শায়িত ন্যগ্রোধ-মৃগরাজকে দেখে অবাক হয়ে গেল। কারণ সে জানে, রাজা মৃগরাজদের মুক্তি দিয়েছেন। পাচক তখন রাজাকে এ-বিষয়ে জানালে রাজা বধ্যস্থলে এসে মৃগরাজকে বললেন—হে মৃগরাজ, আমি আপনাকে মুক্তি দিয়েছি, তবে কেন আপনি যূপকাষ্ঠে মাথা রেখেছেন?

বোধিসত্ত্ব বেদনায় দ্রবীভূত- কম্পিত অথচ মধুর-গম্ভীর ও নম্রস্বরে বললেন—হে রাজন্, এবারের পালা একটি গর্ভিণী হরিণীর। সে আমাকে কাতরভাবে পালাবদলের আবেদন করেছে। কিছুদিন মাত্র তার শিশুকে দেখতে চায়, লালন-পালন করে বড় করতে চায়—তারপর তারা দুজনেই প্রাণ দেবে—এমন কথাই সে বলেছে। আমি মৃগরাজ। মৃগদের রক্ষা করাই আমার কর্তব্য। এই হরিণীর পালা কার উপর চাপাব? প্রাণ হারানোর ভয়ে সন্ত্রস্ত চঞ্চলচিত্ত মৃগদল আকাশের দিকে চেয়ে আছে। মহারাজ, অন্যের প্রাণ নাশ করতে মন চাইল না, আমি স্বেচ্ছায় বধ্যভূমিতে এসেছি। এর পশ্চাতে অন্য কোনও অভিসন্ধি নেই।

রাজা চমৎকৃত ও অভিভূত হয়ে বললেন—হে প্রিয় স্বর্ণমৃগরাজ, হে মহাকারুণিক প্রভু, আপনি যে-করুণার পরিচয় দিলেন তা মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। এ এক বিরল দৃষ্টান্ত! আপনি মহাপ্রাণ। যূপকাষ্ঠ থেকে উঠুন, আপনাকে ও গর্ভবতী মৃগীকে প্রাণের জন্য অভয় প্রদান করলাম।

বোধিসত্ত্ব মাথা না তুলে বললেন—মহারাজ, আমরা মাত্র দুজন মৃগ অভয় পেলাম। কিন্তু অবশিষ্ট মৃগদের অদৃষ্টে কী ঘটবে?

রাজা বললেন—অবশিষ্ট মৃগদেরও অভয় দিলাম।

বোধিসত্ত্ব তখনও যূপকাষ্ঠ থেকে মাথা তুললেন না, বললেন—বনের অন্য মৃগ, বিহঙ্গ, পশুকুল ও জলচর প্রাণীদের কী গতি হবে?

রাজা বললেন—তাদেরও অভয় দিলাম।

সমস্ত জীবকুলের মুক্তির শপথ শুনে বোধিসত্ত্ব মৃগরাজ মাথা তুলে যূপকাষ্ঠ থেকে উঠে দেখলেন রাজা এখন অন্য মানুষ, বিবেকবান, বিচক্ষণ, চিত্ত তাঁর করুণার্দ্র। রাজাকে পঞ্চশীল উপদেশ প্রদান করলেন মৃগরাজ; রাজ্যপরিচালনার জন্য আরও কিছু ধর্মোপদেশ দিয়ে মৃগদল নিয়ে শাখামৃগের সঙ্গে তাঁদের পরিচিত বনে ফিরে এলেন। মৃগদের আগমনে ও আনন্দরবে বন মুখর হয়ে উঠল, বনের অন্যান্য পশুপাখি মহানন্দে নৃত্যগীত আরম্ভ করে দিল। স্বর্গের দেবতারাও এমন মধুর দৃশ্য দেখে আনন্দিত হলেন।

মৃগদল বনে এসে নির্ভয়ে বাস করতে লাগল। শীঘ্রই সেই হরিণী একটি সুন্দর শিশুর জন্ম দিল—সে যেন কোমল ঘন বাদামি রঙের উপর স্বর্ণবিন্দুময় একটি সোনার কমলকোরক—কী চঞ্চল! কী চমৎকার বড় বড় চোখ, মুখ, কান, শিং, লেজ, পায়ের পেলব কালো খুর—মনপ্রাণ ভরে যায় মৃগজননীর। মৃগশিশু আনন্দে বড় হতে লাগল, সে শাখামৃগের সঙ্গেও খেলা করতে যেত—একদিন তা চোখে পড়ল মৃগীর। তার মনে পড়ে গেল অতীতের দুঃখময় ভয়ানক উৎকণ্ঠার দিনগুলির কথা। সে তখন তার শিশুকে উপদেশ দিল—ওই শাখামৃগরাজের কাছে যেয়ো না। অনন্ত জীবনও যদি সে দান করে, তবুও তার সঙ্গ বর্জন কোরো। দয়ালু, মহান ন্যগ্রোধ-মৃগরাজের সঙ্গে খেলা করো, তাঁর কাছে শিক্ষা নিয়ে চিত্ত জয় করো। তাঁর সংসর্গে থেকে যদি মৃত্যু হয় সেও ভাল।

এদিকে রাজার নির্দেশে বারাণসীরাজ্যের কোথাও মৃগয়া হয় না। মৃগদলও নির্ভয়ে মাঠের শস্য খেয়ে বেড়াতে লাগল। এর ফলে প্রজাদের শস্য নষ্ট হল, তারা রাজার কাছে অভিযোগ জানাল। রাজা বললেন—আমি তাদের অভয় দান করেছি, রাজ্য যায় যাক, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারব না। রাজ্যে কোনও পশুপাখি বধ চলবে না। কৃষকেরা নিরাশ হয়ে ফিরে এল, ভাবল—খাব কী!

বোধিসত্ত্ব ন্যগ্রোধ-মৃগরাজ সব শুনে বিচলিত হয়ে মৃগদলকে ডেকে নির্দেশ দিলেন—তোমরা মাঠের ও বাগানের চাষ করা শস্য খাবে না। বনের ঘাস-লতা-পাতা-বনফুল-ফল খাবে, কিন্তু মানুষের ক্ষতি করবে না।

এরপর তিনি কৃষকদের কাছে গিয়ে বললেন—তোমরা তোমাদের খেতের চারিদিকে শুধু পাতার মালা দিয়ে আপন আপন ক্ষেত্রের সীমানা চিহ্নিত করে রাখবে, বেড়ার প্রয়োজন নেই। কোনও মৃগ আর খেতে প্রবেশ করে ফসল নষ্ট করবে না। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো, মৃগদল বাধ্য। শুভবোধ তাদের মধ্যে সৃষ্টি করা প্রয়োজন, সে-প্রচেষ্টায় আমি অবশ্যই সুফল লাভ করব।

দেখা গেল, সত্যই হরিণেরা আর কোনওভাবেই মানুষের ফসল নষ্ট করে না, তাদের চাষ করা মাঠ বা বাগানে ঢুকে পড়ে না। বোধিসত্ত্ব এতে সুখী হলেন। প্রবাদ রয়েছে, সেইসময় থেকেই কোনও খেতের সীমানায় পাতার মালা থাকলে, কোনও হরিণ সেই খেতে প্রবেশ করে না।

ওই বনে বহুদিন বোধিসত্ত্ব বাস করলেন। তিনি অনুচরদের সবসময় সদাচার শিক্ষা দিতেন। বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তও বোধিসত্ত্বের ধর্মোপদেশ অনুসরণ করে, পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যশাসন ও জীবনযাপন করেছিলেন।

জাতককথা বর্ণনার শেষে বুদ্ধদেব জানালেন—সেই কালে দেবদত্ত ছিল শাখামৃগ, ভিক্ষুণী সন্ন্যাসিনী ছিলেন সেই গর্ভবতী হরিণী, ভিক্ষু রাজকুমার কশ্যপ ছিল হরিণশিশু, শিষ্য আনন্দ ছিল বারাণসীর রাজা এবং আমি নিজে ছিলাম ন্যগ্রোধ-মৃগরাজ।

অজন্তাবক্ষে এই জাতককথার চিত্রে দেখছি—ন্যগ্রোধ-মৃগরাজ প্রাণদানের জন্য প্রস্তুত, ডানদিকে অবাক পাচক হাঁটুমুড়ে বসে। রাজাকে দেখা যাচ্ছে রান্নাঘরের কাছে ন্যগ্রোধ-মৃগরাজের সঙ্গে কথোপকথনরত।

এরপরের চিত্রে বোধিসত্ত্ব ন্যগ্রোধ-মৃগরাজ সিংহাসনে বসে ধর্মদেশনা করছেন—এক রাজদম্পতি মাটিতে বসে রয়েছেন। জাতককথার শেষ দৃশ্যটি দরজার উপরে—যেখানে একটি স্তূপচিত্র, পশুপাখিদের দল, ওরা যেন বোধিসত্ত্বকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। পাখিরা আনন্দে কলকাকলি করছে, পশুরাও যেন হর্ষধ্বনি করছে। শোনা যায়, মৃগদলের নির্ভয়ে বিচরণের সেই বনস্থলই এখন বারাণসীর সারনাথের মৃগদাব। ন্যগ্রোধ-জাতকের চিত্রাবলির বেশির ভাগই খণ্ডখণ্ড ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। *(ক্রমশ)*

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীসারদা মঠের তৃতীয় অধ্যক্ষা পরমপূজনীয়া প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজীর একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হতে চলেছে। মাতাজীর পূত সঙ্গ যাঁরা লাভ করেছেন তাঁদের প্রতি অনুরোধ, মাতাজী সম্পর্কিত স্মৃতিচারণ বা মাতাজীর লেখা চিঠি নিবোধত পত্রিকা অফিসে পাঠিয়ে দিন। আপনার লেখা বা চিঠি, ছবি ইত্যাদির নকল পাঠাবেন, কারণ মনোনীত বা অমনোনীত কোনও পাণ্ডুলিপিই ফেরত দেওয়া হবে না। সম্পাদিকামণ্ডলীর নির্বাচনই চূড়ান্ত। গ্রন্থপ্রকাশে আপনাদের সর্বাঙ্গীণ সহায়তা কাম্য।
Email:srismath@gmail.com,nibodhata@hotmail.com